দেশের সবুজ রত্ন পান্না কায়সার

রোজ অ্যাডেনিয়াম

পান্না অর্থ গাঢ় সবুজ রঙের রত্ন পাথর। রূপ কথার গল্পে হীরা চুনি পান্নার কথা কে না শুনেছেন। কিন্তু যেই পান্নার কথা আমরা বলতে এসেছি তিনি রত্ন পাথরের থেকেও বিশেষ। তিনি আমাদের পান্না কায়সার। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য শিক্ষক, লেখক, গবেষক, রাজনীতিবিদ। একজন আদর্শ মা, শিশু সংগঠক ও সাবেক সংসদ সদস্য। গুণী এই মানুষটি সবাইকে ছেড়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জামিয়েছেন ২০২৩ সালের ৪ আগস্ট। তার বয়স হয়েছিলো ৭৩ বছর। ৬ আগস্ট মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মে ২৫, ১৯৫০-আগস্ট ৪, ২০২৩

নারীর অগ্রগতির জন্য যে সব মহিয়সী নারীরা সংগ্রাম করে গেছেন তাদের মধ্যে পান্না কায়সারও অন্যতম। তার পুরো জীবনটাই একটা যুদ্ধ। তার বাস্তব জীবনের পথচলা হার মানায় গল্পকে। এই আলোকিত মানুষেটিকেই নিয়েই আলোকপাত করবো আমরা। রঙেবেরঙ পত্রিকার পক্ষ থেকে পান্না কায়সারের পরিবারের প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা।

জমিদার বাড়ির মেয়ে

পান্না কায়সার জন্মেছিলেন জমিদার ঘরে। ১৯৫০ সালের ২৫ মে কুমিল্লা জেলায় পান্না কায়সারের জন্ম। তার পারিবারিক নাম সাইফুন্নাহার চৌধুরী। জমিদার বাবা ছিলেন অসাধারণ একজন মানুষ। যিনি নিজের ধনদৌলত অকাতরে অভাবী নিপীড়িত মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। কুমিল্লা জেলার পয়ালগাছা গ্রামের জমিদার মোসলেম উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন পান্না কায়সারের বাবা। যিনি গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে জমি দান করেছিলেন। পরে স্কুলের আয়ের জন্যে আরও সম্পত্তি দান করেন। সেই গ্রামের স্কুলটিই পরে পান্না কায়সারের হাত ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত হয়। বাবা-মায়ের ভালোবাসায় সমৃদ্ধ শৈশব কৈশোর কাটিয়েছেন পান্না কায়সার। সবকিছুই ঠিক চলছিল। কিন্তু কলেজ জীবন শুরু হতে না হতেই ঝড় এলো জীবনে।

কলেজে পা রাখতেই বিয়ে

কুমিল্লা মহিলা কলেজে পড়েছেন পান্না কায়সার। সেখানেই কলেজ হোস্টেলে থাকতেন। হঠাৎ পরিবারের ইচ্ছায় কলেজজীবন শেষ হতে না হতেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরান ঢাকার উর্দু সংস্কৃতিমনা ধনাঢ্য এক পরিবারে বিয়ে হয়ে যায় তার। এরপরই থমকে যায় জীবন। শ্বশুরবাড়ির অমানবিক পরিবেশ তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। বিয়ের সময় যৌতুক না দেওয়ার জন্য হাজারটা খোঁটা শুনতে হয় তাকে। নিজের পড়ালেখা শেষ করবেন সেই পথও খোলা ছিল না আর। তাই একদিন কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন পান্না কায়সার।

শ্বশুর বাড়ি থেকে পলায়ন

পান্না কায়সারের জন্য তার শ্বশুর বাড়ি অসহ্য হয়ে উঠেছিল সেই সময়। একপর্যায়ে তার এক বোনজামাইয়ের সহযোগিতায় শ্বশুর বাড়ি ত্যাগ করেন তিনি। বাবার অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে চলে আসেন তিনি। এরপর আর সেখানে ফিরে যাননি। অল্প কয়েক দিনের এই সংসার জীবনের কথা অনেকেরই অজানা। এখান থেকে ফিরে এসে আবারও পড়ায় মন দেন পান্না কায়সার।

কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ও বিপদ পিছু ছাড়েনি তার। কুমিল্লায় কলেজ থেকে হোস্টেলে ফেরার পথে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে অপহরণের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিশোরী পান্না অনেক বুদ্ধি করে তাদের হাত থেকে বেঁচেছেন। আরেকবার রাতের বেলা হোস্টেলের ভাঙা দেয়াল দিয়ে ঢুকে ভেতরের আঙিনা থেকে তাকে অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তার চিৎকার শুনে হোস্টেলের বাবুর্চি ও কর্মচারীরা দৌড়ে গিয়ে তাকে রক্ষা করে।

প্রথম স্বামীকে লেখা শেষ চিরকুট

শ্বশুরবাড়ির পক্ষে পান্না কায়সারের প্রথম স্বামী মি. জনের এক বন্ধু যখন তাকে নিয়ে আসার জন্যে তার বোনের বাসায় হাজির হয়েছিল। পান্না কায়সার এক চিরকুট লিখে দিয়ে ভদ্রলোককে বিদায় করেছিলেন। সেখানে লিখেছিলেন, 'তোমাদের পুরান ঢাকার অন্ধকার গলিতে আমি আর ফিরব না। তোমাদের বাড়ির দেয়াল ঠিকরে বাইরের আলো পড়ে না। তাই তোমাদের দৃষ্টি ও মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমাদের মন ও দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখতে পাওনি বলেই ও বাড়িতে আমি কোনো মর্যাদা পাইনি। তোমাদের নির্মম ও নিষ্ঠুর ব্যবহার আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। তোমাদের ফাঁকি আমার কাছে ধরা পড়েছে। তোমাদের বাড়ি না গেলে তোমাদের এই অসহায় রূপ আমি দেখতে পেতাম না। সেজন্য তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি আর ফিরব না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি

শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে নিজের স্বপ্ন পূরণের লড়াইয়ে লেগে পড়েন পান্না কায়সার। বেশ এগিয়ে যেতে থাকে পান্না কায়সারের লেখাপড়া। এইচএসসি পাস করে কুমিল্লা মহিলা কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি নেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বাংলা বিভাগে। স্নাতকোত্তর শেষ করেন সেখান থেকে।

শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে বিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই তরুণ বুদ্ধিজীবী, লেখক শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল এক দিনে কারফিউয়ের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়। এরপর তাদের সংসারজীবন ভালোই কাটছিল। মাত্র আড়াই বছর পার হতে না হতেই তার জীবনে নেমে আসে ঝড়, পুরো জীবনটাই পাল্টে যায়। তারপর শুরু হয় অন্যরকম এক জীবন যুদ্ধ।

ফিরলেন না শহীদুল্লা কায়সার

বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে স্বামীকে হারান পান্না কায়সার। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনীর কিছু সদস্য শহীদুল্লা কায়সারকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। আর ফিরে আসেননি তিনি। এদিকে দুই সন্তানকে নিয়ে অথই সাগরে পড়েন পান্না কায়সার। তার দুই সন্তান শমী কায়সার এবং অমিতাভ কায়সারকে অনেক কষ্ট করে একা হাতে বড় করে তুলেছেন তিনি।

শিক্ষক ও লেখক পান্না কায়সার

পান্না কায়সার পেশাগত জীবনে শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা করেছেন বেগম বদরুন্নেসা কলেজে। পাশাপাশি করে গেছেন লেখালেখি। তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে', 'মুক্তি', 'নীলিমায় নীল', 'হৃদয়ে বাংলাদেশ', 'মানুষ', 'অন্য কোনখানে', 'তুমি কি কেবলি ছবি', 'রাসেলের যুদ্ধযাত্রা', 'দাঁড়িয়ে আছ গানের ওপারে', 'আমি', 'না পান্না না চুনি', 'অন্য রকম ভালোবাসা' ও সুখ।

সংসদ সদস্য পান্না কায়সার

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের হয়ে সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি হিসেবেও দায়িত্ব পান পান্না কায়সার। এমপি হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছেন পাঁচ বছর। ওই সময় সংস্কৃতি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

শহীদজায়া হিসেবে সব সময় সম্মানিত হয়েছেন পান্না কায়সার। ছেলে মেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করেছেন। তার জন্যও প্রশংসিত হয়েছেন সব সময়। আর লেখক হিসেবে পেয়েছে অনেক পাঠকের ভালোবাসা। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় অবদানের জন্য ২০২১ সালে পান্না কায়সারকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সব মিলিয়ে তার প্রাপ্তি অনেক।

হঠাৎ অসুস্থ, অতপর হাসপাতালে

গুণী এই মানুষটি হঠাৎ করেই ২০২৩ সালের ৪ আগস্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হয় পান্না কায়সারকে। ততক্ষণে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওইদিন গুলশানের আজাদ মসজিদ এবং ইস্কাটনে জানাজার পর তার মরদেহ রাখা হয় বারডেম হাসপাতালের হিমঘরে।

মা'কে নিয়ে শমী কায়সার

মায়ের মৃত্যুর পর মা'কে নিয়ে শমী কায়সার তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তার কথায় উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার লড়াইয়ে পান্না কায়সারের ভূমিকা। তিনি বলেন, 'এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের কথা মতো মানুষ ছিল না, ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছিল। তখন তিনি সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে শিশুদের জন্য খেলাঘর প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেন। মা হিসেবে বলছি না, তিনি আমার কাছে মহীয়সী নারী। তাকে আমি কখনো কোনো কিছুতে হার মানতে দেখিনি। ৭৫ পরবর্তী পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিপর্যায়ের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। পান্না কায়সার একটার পর একটা যুদ্ধ করে গেছেন। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টকে তিনি কখনোই সামনে নিয়ে আসেননি। তিনি কষ্ট থেকে শক্তি অর্জন করেছিলেন।'

পান্না কায়সারকে নিয়ে সিনেমা

শহীদজায়া পান্না কায়সারের জীবন অবলম্বনে সরকারি অনুদানে তৈরি হচ্ছে একটি সিনেমা। এই সিনেমায় তার ভূমিকাটি করছেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। সিনেমাটির নাম 'দিগন্তে ফুলের আগুন'। ওয়াহিদ তারেকের পরিচালনায় আগস্টের ১ তারিখ থেকে ঢাকার ইস্কাটনে সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়েছে। এই সিনেমার প্রযোজক পান্না কায়সারের মেয়ে শমী কায়সার। মিম বলেন, 'এই সিনেমার জন্য গেল দুই মাস ধরে বই পড়ে, টেলিভিশনের বিভিন্ন ইন্টারভিউ থেকে তাকে জানার চেষ্টা করেছি। তার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। ভেবেছি সেই মানুষটার সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্প করব, নানান অভিজ্ঞতা শুনব, আড্ডা দেব; জীবনের অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা হবে। অসাধারণ মুহূর্তের সাক্ষী হব। সেটা আর হলো না। চাইলেই কি আর সব পূরণ হয়। সৃষ্টিকর্তার কাছে তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।'

৬ আগস্ট ফুলেল শ্রদ্ধা ও চিরবিদায়

৬ আগস্ট সকালে পান্না কায়সারের মরদেহ আনা হয় শহীদ মিনারে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় শেষ বিদায় জানানো হয় লেখক, গবেষক, শিশু সংগঠক, সাবেক সংসদ সদস্য, শহীদজায়া পান্না কায়সারকে। ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় শিশু কিশোরদের সংগঠন খেলাঘরসহ বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষক, মন্ত্রী, রাজনীতিক, অভিনয়শিল্পী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এ সময় পান্না কায়সারের মেয়ে অভিনেত্রী শমী কায়সারসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধা জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, নাট্যকার রামেন্দু মজুমদার, লেখক শাহরিয়ার কবির, সাংবাদিক শ্যামল দত্ত, চিত্রনায়ক ফেরদৌস, অভিনেত্রী আফসানা মিমিসহ আরও অনেকে।

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর মরদেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে আনা হয়। বাদ জোহর এখানে তৃতীয় জানাজার পর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মরদেহ আনা হয় বাংলা একাডেমিতে। একাডেমির বটতলার নজরুল মঞ্চের সামনে একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা একাডেমির কর্মকর্তা কর্মচারী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক পান্না কায়সারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একাডেমি থেকে মরদেহ আনা হয় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে। ৬ আগস্ট মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় পান্না কায়সারকে। আর কখনো দেখা হবে না তার সঙ্গে। তবে তিনি থেকে যাবেন তার কাজের মধ্যে।